পার্বত্য অঞ্চলে মসলা চাষে নীরব বিপ্লব

আধুনিক পদ্ধতিতে মসলা চাষের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধির পাশপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্বনির্ভরতা

প্রকল্প বাস্তবায়নে ঃ-

OPCA (অপকা)

Organization for the Poor Community Advancement (OPCA)

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়ঃ-

Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) Project

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পার্বত্য এলাকায় মসলা চাষে নিরব বিপ্লব

"আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের মসলা উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের আয়বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় : " Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC)" প্রকল্প
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্প বাস্তবায়নে ঃ-
OPCA (অপকা)
Organization for the Poor Community Advancement (OPCA)

প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৪

উপদেষ্টা : মোঃ আলমগীর
নির্বাহী পরিচালক, অপকা (অর্গানাইজেশন ফর দ্যা পুওর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট)

সম্পাদনায় : মোঃ মনির হোসেন
ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ
মোঃ মাহমুদুর রহমান
সরকারী ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ
কবীর শাহারীয়ার

প্রকাশনায় : অপকা (অর্গানাইজেশন ফর দ্যা পুওর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট)
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় :
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পরামর্শক : আলতাফ হোসেন

সহায়তায় : অরেঞ্জ বিডি কমিউনিকেশন

ডিজাইন এবং প্রিন্টিং : Bee Communication
Fakirerpool, Dhaka.
Cell: 01756630734

নির্বাহী পরিচালকের বাণী

চটগ্রাম জেলার মিরসরাই ও ফটিকছড়ি উপজেলায় পাহাড়ী অঞ্চলের কৃষকগণ দীর্ঘদিন থেকে বংশপরম্পরায় মসলা জাতীয় ফসল চাষ করেন। সনাতনী পদ্ধতি এবং স্থানীয় জাতের বীজ তাদের একমাত্র অবলম্বন। দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল বলে এই এলাকায় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা রয়েছে। ত্রিপুরা আদিবাসী জনগোষ্ঠী উঁচু পাহাড়ে বসবাস করে। হাজার হাজার একর অনাবাদী জমি থাকলেও ভাল বীজ , উন্নত প্রযুক্তি ও ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়ায় স্থানীয় হতদরিদ্র কৃষক সম্ভাবনাময় মসলা চাষে উদ্বুদ্ধ হয়নি। সম্প্রতি স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা অপকা (অর্গানাইজেশন ফর দ্য পুওর কমিউনিটি অ্যাডভান্সমেন্ট) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ফেডেক প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মসলা চাষ সম্প্রসারণ ও টেকসই বিপণনের জন্য "আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চফলনশীল জাতের মসলা উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের আয়বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" গত দুই বছরব্যাপী বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার, মাঠ দিবস, কর্মশালা, ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাজার বিশ্লেষণ ও বাজারজাতকরণের নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করে। সনাতনী পদ্ধতি পরিহার করে উচ্চফলনশীল জাতের বীজ বপনের মাধ্যমে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় ভাগ্যাহত হতদরিদ্র কৃষকদের মাঝে মসলা চাষের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। চার/পাঁচ গুণ ফলন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিবেশী কৃষকদের মাঝে তৈরি হয় প্রেরণা।

অনাবাদী জায়গায় আবাদ করে গরিব কৃষক এখন স্বাবলম্বী। আড়ৎদার, পাইকার, খুচরা বিক্রেতার সঙ্গে উৎপাদনকারীদের সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ব্যাপকভাবে এই অঞ্চলে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে গরিব কৃষকদের মুখে হাসি ফুটবে এবং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে মসলা রপ্তানি করে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি।

মো: আলমগীর
নির্বাহী পরিচালক
অপকা (অর্গানাইজেশন ফর দ্য পুওর কমিউনিটি অ্যাডভান্সমেন্ট)

২৫ মার্চ, ২০১৪

মুখবন্ধ

যুগ যুগ ধরে মানুষ উদ্ভিদ কিংবা উদ্ভিদের বিভিন্ন উপাদান বিশেষ করে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল খাবারের স্বাদ বৃদ্ধির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এসব উপাদানকে এক কথায় মসলা বলা হয়। খাবারকে মুখরোচক করে তুলতে মসলার গুরুত্ব অপরিসীম। মসলা সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- সাধারণ বা স্পাইসি মসলা, সুগন্ধি বা কন্ডিমেন্ট মসলা ও গুল্ম বা কিউলিনারি হার্ব মসলা। প্রথমত স্পাইসি মসলা বলতে হলুদ, মরিচ ও আদাকে বুঝানো হয়ে থাকে। কন্ডিমেন্ট বা সুগন্ধি মসলা হল দারুচিনি, লবঙ্গ ও এলাচকে বুঝানো হয়। আর গুল্ম বা কিউলিনারি হার্ব জাতীয় মসলা হল পুদিনাপাতা, ধনেপাতা ও লেটুসপাতা ইত্যাদি। আমাদের দেশে প্রায় সব ধরনের মসলার ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু চাষাবাদের জন্য পর্যাপ্ত জমি ও উপযুক্ত আবহাওয়া থাকা স্বত্ত্বেও অধিকাংশ মসলাই আমাদের দেশে চাষাবাদ করা হয় না। সে জন্য প্রতিবছরই বিপুল পরিমাণ মসলা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। মসলা শুধু খাবারের স্বাদই বৃদ্ধি করে না, এর অনেক ভেষজগুণও রয়েছে। রসুন হৃদরোগ ও বাতরোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ক্ষত নিরাময়ে হলুদ ব্যবহৃত হয়। মেকআপ আর সৌন্দর্য বৃদ্ধির অনন্য উপাদান হলুদ। হজম শক্তি বাড়াতে পাচক রস নিঃসরণের জন্য গোলমরিচ ব্যবহৃত হয়। খাদ্য ও প্রসাধনী দ্রব্যের সুগন্ধিকরণে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় দারুচিনি। লবঙ্গ ও তেজপাতা হতে প্রস্তুতকৃত তৈল তথা লবঙ্গের তৈল টুথ পেস্টের অন্যতম উপাদান। সর্দি-জ্বর, মাথায় খুশকি ও চর্মরোগ দূরীকরণে পেঁয়াজ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অনেক মসলা আচার কিংবা চাটনি তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। মসলার নানাবিধ ব্যবহার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় সারাদেশে মসলার আবাদ হলেও পার্বত্যাঞ্চলে মসলা বিশেষ করে আদা ও হলুদের আবাদ অনেকগুণ বেশি হয়ে থাকে। অপকা পার্বত্যাঞ্চল বিশেষ করে চট্টগ্রামের মিরসরাই ও ফটিকছড়ির বিভিন্ন ইউনিয়নে মসলা চাষিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নতির জন্য পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় আধুনিক পদ্ধতিতে মসলা চাষের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষে পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের অর্থায়নে মসলা চাষ শীর্ষক ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। সাধারণ পদ্ধতিতে মসলা চাষিদের তুলনায় ফেডেক প্রকল্পের মসলা চাষিদের ফলন তিন থেকে চার গুন বেশি। এবং কৃষকরাও আগের তুলানায় অনেক সাবলম্বী। এভাবে মসলার উৎপাদন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে। এই ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের সফলতা একদিন আঞ্চলিক অর্থনীতির পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি। আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মসলা চাষের বিবরণী ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের অর্জনসমুহ এই পুস্তিকায় তুলে ধরা হল।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা	৫
২	উচ্চ ফলনশীল মসলার জাত পরিচিতি	৭-১২
৩	মসলা চাষের গুরুত্ব	১৩
৪	প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী	১৪
৫	প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা	১৪
৬	প্রকল্পের লক্ষ্য	১৫
৭	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১৫
৮	প্রকল্পের কর্ম এলাকা	১৫
৯	প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ	১৬
১০	মশলার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	১৭-১৯
১১	রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান	২০-২১
১২	প্রকল্পের প্রভাব	২২-২৮
১৩	চ্যালেঞ্জসমূহ	২৯
১৪	সুপারিশ	২৯
১৫	উপসংহার	২৯
১৬	সাফল্যগাথা : এক	৩০
১৭	সাফল্যগাথা : দুই	৩১-৩২

ভূমিকা

যুগ যুগ ধরে মানুষ উদ্ভিদ কিংবা উদ্ভিদের বিভিন্ন উপাদান বিশেষ করে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল খাবারের স্বাদ বৃদ্ধির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এসব উপাদানকে এককথায় মসলা বলা হয়। খাবারকে মুখরোচক করে তুলতে মসলার গুরুত্ব অপরিসীম। মসলা সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- সাধারণ বা স্পাইসি মসলা, সুগন্ধি বা কন্ডিমেন্ট মসলা ও গুল্ম বা কিউলিনারি হার্ব মসলা। প্রথমত স্পাইসি মসলা বলতে হলুদ, মরিচ ও আদাকে বুঝানো হয়ে থাকে। কন্ডিমেন্ট বা সুগন্ধি মসলা হল দারুচিনি, লবঙ্গ ও এলাচকে বুঝানো হয়। আর গুল্ম বা কিউলিনারি হার্ব জাতিয় মসলা হল পুদিনাপাতা, ধনেপাতা ও লেটুসপাতা ইত্যাদি। আমাদের দেশে প্রায় সবধরনের মসলার ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু চাষাবাদের জন্য পর্যাপ্ত জমি ও উপযুক্ত আবহাওয়া থাকা স্বত্বেও অধিকাংশ মসলাই আমাদের দেশে চাষাবাদ করা হয় না। সেজন্য প্রতিবছরই বিপুল পরিমান মসলা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। মসলা শুধু খাবারের স্বাদই বৃদ্ধি করে না, এর অনেক ভেষজগুণও রয়েছে। রসুন হৃদরোগ ও বাতরোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ক্ষত নিরাময়ে হলুদ ব্যবহত হয়। মেকআপ আর সৌন্দর্য বৃদ্ধির অনন্য উপাদান হলুদ। হজম শক্তি বাড়াতে পাচক রস নিরঃসরনের জন্য গোল মরিচ ব্যবহৃত হয়। খাদ্য ও প্রসাধনী দ্রব্যের সুগন্ধিকরণে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় দারুচিনি। লবঙ্গ ও তেজপাতা হতে প্রস্তুতকৃত তৈল তথা লবঙ্গের তৈল টুথ পেস্টের অন্যতম উপাদান। সর্দি-জ্বর, মাথায় খুসকি ও চর্মরোগ দূরীকরণে পেঁয়াজ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অনেক মসলা আচার কিংবা চাটনি তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। মসলার নানাবিধ ব্যবহার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় সারাদেশে মসলার আবাদ হলেও পার্বত্যাঞ্চলে মসলা বিষেশ করে আদা ও হলুদের আবাদ অনেকগুণ বেশি হয়ে থাকে। অপকা পার্বত্যাঞ্চল বিষেশ করে চট্টগ্রামের মিরসরাই ও ফটিকছড়ির বিভিন্ন ইউনিয়নে মসলাচাষিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নতির জন্য পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় আধুনিক পদ্ধতিতে মসলা চাষের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষে পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের অর্থায়নে মসলা চাষ শীর্ষক ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। সাধারণ পদ্ধতিতে মসলা চাষিদের তুলনায় ফেডেক প্রকল্পের মসলা চাষিদের ফলন তিন থেকে চারগুণ বেশি এবং কৃষকেরাও আগের তুলনায় অনেক সাবলম্বী। এভাবে মসলার উৎপাদন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে। এই ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্পের সফলতা একদিন আঞ্চলিক অর্থনীতির পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি। আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মসলা চাষের বিবরণি ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের অর্জনসমুহ এই পুস্তিকায় তুলে ধরা হল।

উচ্চ ফলনশীল মসলার জাত পরিচিতি

আদা ঃ আদা জিনজিবারেসি গোত্রের একটি জনপ্রিয় বাণিজ্যিক ফসল, এর বৈজ্ঞানিক নাম জিনজিবার অপিসিনেল। এটি শুধু একটি মসলাই নয়, নানা রোগের ঔষধ হিসেবেও আদা সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আদার আদি নিবাস ধরা হয়ে থাকে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ভারত, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিয়ন, ব্রাজিল, চীন, জাপান, ও ইন্দোনেশিয়াতে প্রচুর আদার আবাদ হয়ে থাকে। তবে আদা উৎপাদন ও রপ্তানিতে শীর্ষে রয়েছে ভারত। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো সবচেয়ে বেশি আদা আমদানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চল বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে প্রচুর আদার চাষ হয়ে থাকে। আদার স্বাদ ও গন্ধ খুবই আকর্ষণীয়, তাই মসলা হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি আদা চা, আদা কেন্ডি, আদা তেল, ও আদা সফ্‌ট ড্রিংকস তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আদার ভেষজগুণও অনেক বেশি। শুকনো আদায় শতকরা ৫০ ভাগ স্টার্চ, ১.২ ভাগ উদ্বায়ী তেল এবং বিভিন্ন পরিমাণে প্রোটিন, রেজিনসহ প্রভৃতি উপাদান আছে।

জলবায়ু ঃ আদা চাষের জন্য গরম ও ভেজা আবহাওয়া বেশ উপযোগী। অল্প ছায়া আছে এমন জায়গায় আদা ভাল হয়। আদা বৃষ্টির জলেই চাষ হয়। সমুদ্রের সমতলবর্তী অঞ্চল থেকে শুরু করে ১৫০০ মিটার উঁচু পার্বত্য অঞ্চলেও আদার চাষ ভাল হয়।

মাটি ঃ উঁচু বেলে দোআঁশ, দোঁয়াশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটিতে আদা ভাল হয়। জমিতে পানি নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকতে হবে। কারণ জমিতে পানি জমে থাকলে আদা পচে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

জমি তৈরি ঃ আদার জমি খুব ঝুরঝুরে করে তৈরি করা দরকার। ৬-৭ বার কষণ ও তারপর মই দিয়ে ভালভাবে মাটি তৈরি করে নিতে হবে। এ সময়ে প্রতি একরে ৮-১০ গাড়ি গোবর সার ও আবর্জনা সার মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

রোপণের সময় ঃ সেচের সুবিধা থাকলে বৈশাখ মাসে আদা লাগানো যায়। কিন্তু অ-সেচ এলাকায় জৈষ্ঠ মাসে আদা রোপন করা যায়।

বীজ আদা শোধন ঃ ৭৫-৮০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম এমিসন-৬ বা ম্যানকোজেব ৭৫ শতাংশ ডব্লিও-পি (ডাইথেন-এম-৪৫) মিশিয়ে তাতে এক কুইন্টাল বীজ আদা এক মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর পানি থেকে বীজ আদা তুলে ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে রোপণ করতে হবে। আদা রোপণের আগে একটি ঝুড়িতে কিছু খড় বিছিয়ে ছোট ছোট বীজ আদা তার ওপর রেখে খড় বা থলে দিয়ে সেগুলোকে ঢেকে রাখলে আদার 'কল' বের হবে এবং এ রকম আদা রোপণ করলে তাড়াতাড়ি গাছ গজাবে।

রোপণের পদ্ধতি ঃ সরু লাঙল বা কোদাল দিয়ে ২০-২২ ইঞ্চি (৫০-৫৫ সেমি) দূরে দূরে নালি কেটে তাতে ৬-৭ ইঞ্চি (১৫-১৭.৫ সেমি) দূরে দূরে দু-তিনটে চোখসহ আদার টুকরো লাগাতে হবে। যে অঞ্চলে বৃষ্টি বেশি এবং মাটি এঁটেল অথবা সেচ দিয়ে আদা চাষ করা হয়, সেখানে ঐ একই দূরত্বে কোদাল দিয়ে ভেলি তৈরি করে তাতে আদা রোপণ করা হয়।

বীজের পরিমাণ ঃ প্রতি একরে ৪-৫ কুইন্টাল বীজ আদা লাগাতে হয়। আদা অল্প ছায়ালো জায়গায় ভাল হয় বলে জমির ধারে ছায়া দেওয়া গাছ থাকলে ভাল হয়।

সার প্রয়োগ ঃ আদার ভাল ফলন পেতে হলে শেষ চাষের আগে একরে ৪০ কেজি নাইট্রোজেন, ৬০ কেজি ফসফরাস ও ৫০ কেজি পটাশিয়াম দিতে হবে। প্রতি একরে ২৫০ কেজি সর্ষের খৈল দিলে সুফল পাওয়া যায়। আদা রোপণের এক মাস পর একরে ২০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিতে হবে।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ আদা রোপণের ১৫-২০ দিনের মধ্যে গাছের চারা বের হয়। দু-তিনবার নিড়ান দিয়ে আগাছা তুলে দিতে হবে। গাছ কিছুটা বড় হলে গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে ভেলি বেঁধে দিতে হবে, এর ফলে যে নালা তৈরি হবে তা সেচ ও নিষ্কাষণের কাজে লাগবে।

সেচ ঃ আমাদের দেশে বৃষ্টির জলেই আদা চাষ হয়ে থাকে। তবে সময়মতো বৃষ্টি না হলে বা অতি খরা চলতে থাকলে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ভাল ফলনের জন্য আদা জমির মাটি সরস থাকা অত্যন্ত জরুরি। সে জন্য ৮-১০ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে।

শস্য রক্ষা ঃ আদার তেমন কোন মারাত্মক ধরনের রোগ কিংবা পোকার উপদ্রব দেখা যায় না। তবে বর্ষার সময় অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে রাইজোম পচা রোগ দেখা দিতে পারে। জমিতে এ রোগ হলে আবাদকৃত এলাকা ধরে আদার পচন হতে থাকে। এমিসন-৬ বা বাগালাল-৬ বা ডাইথেন এম-৪৫ দ্রবনে আদা শোধন করে সংরক্ষণ করতে হবে। এতে রোগের প্রকপ কমে যায়।

ফসল উত্তলন ঃ বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসে রোপণ করা আদা পৌষ মাসে উত্তোলনের উপযোগী হয়। গাছের পাতা হলদে হলে ও ডাঁট শুকাতে শুরু করলে ফসল তোলা যায়। কোদাল দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে আদা তোলা হয়। আদা তুলে মাটি পরিষ্কার করে সংরক্ষণ করতে হয়।

ফলন ঃ প্রতি একরে ৮০-১০০ কুইন্টাল আদার ফলন হয়। আদা শোধন করলে ও শুকালে শতকরা ২৫-৩০ ভাগ আদা পাওয়া যায়।

জাত ঃ আদার কয়েকটি জাত রয়েছে। চায়না, গরুবাথান, সরভি, সম্বক, মরান, সুপ্রভা, রিও-ডি-জেনিরো প্রভৃতি।

আদা সংরক্ষণ ঃ আদা সারা বছর ধরে পাওয়ার জন্যে সহজেই সংরক্ষণ করা যায়। লবণ, এসেটিক অ্যাসিড ও পটাশিয়াম মেটাবাই সালফেটের মিশ্রণে আদা ডুবিয়ে রাখলে প্রায় সারাবছর আদা সরস থাকে। সাধারণত ৫০ গ্রাম লবণ, এক লিটার পানিতে মিশিয়ে এই মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এক কেজি আদার জন্য এই মিশ্রণ এক লিটার থেকে সোয়া এক লিটার দরকার।

সংরক্ষণের জন্য ভাল বাছাই করা পাকা আদা পানিতে ধুয়ে ও খোসা ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে নিতে হবে। এই টুকরো আদা বয়ামের গলা পর্যন্ত ভরে আগের মিশ্রণটির পরিমাণ-মতো দিয়ে বয়ামের মুখে ছিপি দিয়ে ভালোভাবে আটকে দিতে হবে। ছিপি বা ঢাকনা দিয়ে যেন যাতে বাতাস না ঢোকে তার জন্য এর মুখ মোম দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এরপর ঠাণ্ডা অন্ধকার জায়গায় রেখে দিতে হবে। এভাবে সংরক্ষিত আদা এক বছর ধরে ব্যবহার করা যায়। ব্যবহারের আগে আদা ধোয়ার প্রয়োজন নেই।

হলুদ

আদার মতো হলুদও জিঞ্জিবারেসি গোত্রের একটি ফসল। এর বৈজ্ঞানিক নাম (কারকুইমা লংগা) মসলার পাশাপাশি হলুদ ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবেও বেশ পরিচিত। এছাড়া হলুদ ডাইংয়ের কাজেও ব্যবহার হয়ে থাকে। কঁচা হলুদ ঔষুধের পাশাপাশি রূপচর্চার কাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছড়া চর্ম রোগ ও ক্ষত জায়গায় কাঁচা হলুদ লাগালে উপশম হয়। হলুদ শুভকাজের একটি উপকরণ হিসেবেও পরিচিত। বিশেষ করে বিয়ের অনুষ্ঠানে হলুদের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপমহাদেশে হলুদের চাষ ও ব্যবহার অনেক বেশি। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর হলুদের চাষ হয়ে থাকে।

জলবায়ু ঃ সাধারণত গরম ও ভেজা আবহাওয়ায় হলুদের ফলন ভাল হয়। ছায়াযুক্ত জায়গা বিশেষ করে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের বাগানের মাঝে ফাঁকা জায়গায় হলুদ ভাল হয়। ছায়া থাকার জন্য যে সকল জায়গায় ধান, গম বা কোন প্রকার সবজি চাষ করা যায় না সেখানে সহজেই হলুদের চাষ করা যায়। বেশি বৃষ্টিপাত হয় এরকম জায়গায় বৃষ্টির পানি দিয়েই হলুদে চাষ করা যায়। তবে পানি জমে থাকা যায় হলুদ চাষের জন্য অন্তরায়। সমুদ্র তীরবর্তী সমতল অঞ্চল থেকে শুরু করে ১২৫০ মিটার উঁচু পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলেও হলুদের চাষ করা যায়।

মাটি ঃ পানি জমে থাকে না এমন জায়গা হলুদ চাষের জন্য উপযোগী। বেলে দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটিতে হলুদ ভালো হয়। তবে প্রচুর জৈব পদার্থ যুক্ত দোআঁশ মাটিতে হলুদ বেশ বড় হয়। তবে এঁটেল মাটিতে হলুদের চাষ না করাই ভাল।

জমি তৈরি ঃ কমপক্ষে ৭-৮ বার লাঙল ও মই দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরি করতে হবে। প্রতি একরে ১০-১২ গাড়ি গোবর সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাগানে হলুদ চাষ করা হলে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটি তৈরি করতে হবে।

হলুদ রোপণ ঃ বৈশাখ থেকে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত হলুদ লাগানো যায়। প্রতি একর জমিতে ৪৫০-৬০০ কেজি

"হলুদের গেঁড় প্রয়োজন হয়।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠতে হলুদ রো।
দাবা পাশা ফেলিয়া থো।।
আষাঢ়ে-শ্রাবণে নিড়ানে মাটি।
ভাদরে নিড়ায়ে করবে খাঁটি।।
এর অন্যথা পুঁতলে হলদি।
পৃথিবী বলে তা কি ফল দি।।"

সার প্রয়োগ ঃ জমি তৈরির সময় প্রতি একরে ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফরাস ও ২০ কেজি পটাশিয়াম মূল সার হিসেবে দিতে হবে। রোপণের দেড় থেকে দুই মাস পরে প্রতি একরে ২০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার হিসেবে দিতে হবে।

সেচ ঃ আমাদের দেশে প্রধানত বৃষ্টির পানি দিয়েই হলুদ চাষ হয়ে থাকে। বাড়তি সেচের প্রয়োজন হয় না।

রোগবালাই ঃ হলুদের পাতায় দু পিঠে নানা রকম বাদামি দাগ পড়ে। দাগগুলো ডিম্বাকৃতি ও দাগের মাঝখানটা সাদা বা ধূসর হয়। দাগগুলো পরে একে অপরের সঙ্গে মিশে যায় এবং পাতা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে থাকে। প্রতিকার ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি লিটার পানিতে আড়াই গ্রাম ম্যানকোজেব ৭৫ সতাংশ ডব্লিউপি বা জিনেব ৭৫ শতাংশ ডব্লিউপি গুলে আক্রান্ত গাছে ছিটাতে হবে।

ফলন ঃ প্রতি একরে ৬০-৮০ কুইন্টাল হলুদ উৎপান হয় এবং তা থেকে ২৫ ভাগ অর্থাৎ ১৫-২০ কুইন্টাল শুকনো হলুদ পাওয়া যায়।

জাত ঃ হলুদের অনেকগুলো জাত রয়েছে। ডগিবালা, ঠেকুরপেটা, কস্তুরি, পাসূহ, আবসুর, ছায়া পসুপু, সি-১১, সি-৩২৪, সি-৩২৬, সি-৩২৭, সি-এন-৭৩, সি-এন-আই-৩১৭, সগন্ধম, রশ্মি, রোমার, পি-টি-এস-৪৩, কৃষ্ণ, সগুনা, সুরমা, রসমি, সুদর্শন প্রভৃতি।

হলুদ সংরক্ষণ

মাটির গর্তে হলুদ রাখলে তা বেশিদিন রাখা যায়। উঁচু জমিতে ১৫ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট চওড়া গভীর গর্ত করতে হবে এবং সেটি বেশ কয়েকদিনের জন্য খুলে রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর গর্তের চারপাশে খড় বা খেজুর পাতা বিছিয়ে দিতে হবে। গর্তে হলুদ ভর্তি হয়ে গেলে তার উপরে আবার খড় কিংবা পাতা বিছিয়ে দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে।

মরিচ ঃ সোলানেসি গোত্রের মরিচ মসলা হিসেবে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় একটি শস্য। এর বৈজ্ঞানিক নাম কেপসিকাম এনাম/সি. ফ্রুটিসেন্স। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র মরিচের আবাদ হয়ে থাকে। কাঁচা মরিচে শতকরা ৮২.৬ ভাগ জল ৬১ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ২.৯ ভাগ প্রোটিন, ০.৬ ভাগ ফ্যাট, ১.০ ভাগ খনিজ পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণ-সি থাকে। লাল মরিচে ভিটামিন এ ও সি থাকে। ব্রাজিল ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো মরিচের আদি নিবাস হিবেবে খ্যাত। পর্তুগীজরা ভারতে এর চাষ শুরু করে।

জলবায়ু ঃ গরম ও ভেজা আবহাওয়ায় মরিচ ভাল হয়। ফল পাকার সময় শুকনো আবহাওয়া দরকার। মাটির তাপমাত্রা ৬৫-৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট থকলে বীজের অঙ্কুরোদগম ভাল হয়।

মাটি ঃ প্রায় সব ধরনের মাটিতেই মরিচ জন্মে। তবে দোআঁশ, পলি দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটিতে এর চাষ ভাল হয়। মরিচ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

জমি তৈরি ঃ কমপক্ষে ৫-৬ বার আড়াআড়ি ও লম্বলম্বি লাঙ্গল ও মই দিয়ে ভালভাবে মাটি তৈরি করতে হবে। জমি তৈরির সময় প্রতি একরে ১০-১২ গাড়ি গোবর সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। কলা ও বেগুনের সাথে সাথি-ফসল হিসেবেও মরিচের চাষ করা যায়।

বীজ রোপণ ঃ মরিচ প্রায় সারাবছরই চাষ করা যায়। বেগুনের মতো বীজতলায় বীজ বুনে চারা তৈরি করা হয়। ৬-৭ সাপ্তাহের চারা রোপনের উপযোগী হয়। বীজতলা থেকে চারা তুলে বিকেলের দিকে রোপন করতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ একর প্রতি ৪০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফরাস ও ২০ কেজি পটাশিয়াম দিতে হবে। চারা রোপণের একমাস ও দুই মাস পরে প্রতিবারে ১০ কেজি করে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসেবে দিতে হবে।

সেচ ঃ চারা রোপনের পর দু-একদিন সকালে ও বিকালে গাছের গোড়ায় অল্প জল দিতে হবে। তারপর গ্রীষ্মকালে ৪-৫ দিন অন্তর ও শীতকালে ১০-১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে।

রোগ-বালাই ঃ মরিচ গাছে গোড়া পচা রোগ দেখা যায়। ৩-৭ দিনের চারা গাছ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। রোগাক্রান্ত গাছের মাটি সংলগ্ন অংশ কালো হয়ে পচে যায় এবং গাছ ঢলে পড়ে ও মারা যায়। প্রতিকার ব্যবস্থা হিসেবে বীজ শোধন করে বুনতে হবে। বাড়ন্ত গাছে এই রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে দুই গ্রাম কারবেনডাজিম বা ক্যাপটান ৫০ শতাংশ ডব্লিউ পি গুলে আক্রান্ত জমির গাছের গোড়ার মাটিতে দিতে হবে।

ফসল উত্তোলন ঃ চারা রোপণের ৭৫-৯০ দিনের মধ্যে ফল ধরতে শুরু করে। মরিচ কাঁচা ও পাকা উভয়ভাবেই উত্তোলন করা হয়। কাঁচা মরিচ তুলতে হলে বড় ও পুষ্ট দেখে তুলতে হয়। পাকা মরিচ তুলে রোদে শুকানো হয়। ভালোভাবে পাকলে মরিচের গুঁড়ায় ভাল রং ধরবে। ১০-১৫ দিন রোদে শুকাতে হয়।

ফলন ঃ প্রতি একরে ১২-২৪ কুইন্টাল কাঁচা মরিচ ও ৩-৬ কুইন্টাল শুকনো মরিচ পাওয়া যায়। পাকা মরিচের ওজনের শতকরা ২৫-৩০ ভাগ শুকনো মরিচ পাওয়া যায়।

জাত ঃ গ্রীষ্মকালীন জাত: মানিকচক, আকাশি, গোল বা ভুটিয়া মরিচ, পাটনাই, পুসা সদাবাহার, কাজলী প্রভৃতি। শীতকালীনজাত: সিটি, শিকার পুরি, ভারতীয় ইত্যাদি।

মসলা চাষের গুরুত্ব

মসলা জাতীয় ফসলকে পুষ্টি উপাদানের উৎস হিসেবে বিবেচনা না করে বরং খাদ্যের স্বাদ ও সংরক্ষণ গুণাবলী গুণ বৃদ্ধির উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু মসলার মধ্যে অনেক পুষ্টি ও ভেষজ উপাদান বিদ্যমান। আচার চাটনি কেচাপ মোরব্বা প্রভৃতি তৈরিতে এবং এদের সংরক্ষণ গুণাগুণ বৃদ্ধিতে সাধারণত মসলার ব্যবহার বেশি। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে ভেষজ উদ্ভিদ হিসাবে মসলা ফসলের গুরুত্ব স্বীকৃত। হেকমী আয়ুর্বেদীয় ও অন্যান্য। চিকিৎসাশাস্ত্রে ঔষধ তৈরিতে বিভিন্ন প্রকার মসলা ব্যবহৃত হয়। আদা হজমিকারক, অগ্নিবর্ধক, রুচিকারক, মুলনিবারক এবং স্বর ও মুক্রবর্ধক বলে কথিত।

মসলার পুষ্টি উপাদান নিম্নে দেওয়া হল

ফসলের নাম	আমিষ (গ্রাম)	শ্বেতসার (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	খনিজ লবন (গ্রাম)	ভিটামিন বি-১ মিঃ গ্রাম	ভিটামিন সি মিঃ গ্রাম	ক্যালসিয়াম মিগ্রা	লৌহ মিগ্রা	ক্যারোয়ান	খাদ্যশক্তি
আদা	২.৩	১২.৩	০.৯	১.২	০.০৬	৬	২০	২.৬	৪০	৬৭
হলুদ	৬.৩	৬৯.৩	৫.১	৩.৫	০.০৩	০	১৫০	১৪.৮	৩০	১৪৯

বাংলাদেশের চাষিরা নিজেদের প্রয়োজন জমির পরিমান ১৪৩.৮২ হেক্টর যা থেকে ৩ লক্ষ ১৬ হাজার টন মসলা উৎপাদিত হচ্ছে। অপর দিকে আমাদের চাহিদা হচ্ছে প্রায় ৭ লক্ষ টন। এর মধ্যে ৫০ ভাগ জমিতে মরিচ এবং ২৪ ভাগ জমিতে পেয়াজের চাষ হয়ে থাকে (আদা হলূদ)। চাহিদার বাকি মসলা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। লবঙ্গ, এলাচ, গোলমরিচ, দারুচিনি উপযুক্ত জলবায়ুর অভাবে এদেশে চাষ করা যায় না। সিলেট অঞ্চলে গোলমরিচের চাষ হয়। দারুচিনি, এলাচ, জিরা ও গোলমরিচ আমদানি করতে প্রতি বছর ব্যয় করতে প্রায় ৩৬ কোট টাকা।

কয়েকটি মসলা ফসল ও মাঠ ফসল চাষবাদে তুলনা মূলক লাভের পরিমাণ ঃ

মাঠ ফসল	হেক্টর প্রতি মুনাফা (টাকা)	মসলা ফসল	হেক্টর প্রতি মুনাফা (টাকা)
আলু	২০৮১০.০০	আদা	৭৪০০০.০০
বোরো ধান	৬৯২০.০০	হলুদ	২৯৬৪০.০০
মিষ্টি আলু	৪৭৩০.০০	মরিচ	২৪৬৭০.০০

আমাদের দেশের আবহাওয়া পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ এসব মসলা চাষের অত্যন্ত উপযোগী। প্রতি বছর রবি মৌসুমে আবাদি জমির একটি বিরাট অংশ সেচের আওতায় এনে এসব জমিতে অল্প আকারে মসলা জন্মানো যেতে পারে। স্বল্প সেচে মাঠ ফসলের তুলনায় মসলার চাষ করে একদিকে যেমন মসলার দেশজ চাহিদা মেটানো সম্ভব, তেমনি আমদানি কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো সম্ভব। এর চাষ বাড়লে দেশের অর্থনৈতিক সফলতার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান ও বহুমুখী ব্যবহার ও বাড়বে। পরিশেষে বলা যায় যে, এক সময়ে মসলার দেশ হিসাবে খ্যাত এদেশে মুনাফার খোঁজে পশ্চিমের মানুষ তাদের বাণিজ্য তৈরি পূর্বদিকে ঘুরিয়ে ছিল। হয়তো আমাদের কৃষকদের নিপুণ হাতের গুণে আর কৃষি কর্মে নিয়োজিত গবেষক ও সম্প্রসার কর্মীদের শ্রমে ও সেবার অতীতের সে সুনাম আবার ফিরে আসবে।

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী

প্রকল্পের মেয়াদ কাল	ঃ দুই (২) বছর
প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	ঃ ১৫ মার্চ ২০১২ থেকে১৫ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত
প্রকল্পের উপকার ভোগী	ঃ আদা,হলুদ ও মরিচ চাষী
প্রকল্পের উপকার ভোগী চাষীর সংখ্যা	ঃ দুইশত পঞ্চাশ (২৫০) জন
প্রকল্পের কর্ম এলাকা	ঃ চট্রগ্রাম জেলার মিরসরাই ও ফটিকছড়ি উপজেলার করেরহাট ও দাঁতমারা ইউনিয়ন
প্রকল্পের মোট বাজেট	ঃ ২৬,০৫,৪,৭০ এর মধ্যে পিকেএসএফ হতে অনুদান ১৬,৮৮,০৮৫ টাকা অপকা ৮,৫০,১৮৫ টাকা এবং উদ্যোক্তা ৬৭,২০০ টাকা বহন করেছে

প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা

পাহাড়ি এলাকায় মসলা চাষ কার্যক্রমকে আরো লাভজনক করতে হলে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মসলা চাষে অধিক আগ্রহী করে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া কার্যক্রমকে আরো সহজ ও সাবলীল করে তুলতে কিছু উপাদান যেমন- সার ও উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা প্রয়োজন। এ সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে উদ্যোক্তাদের আয় দ্বীগুণ থেকে তিনগুণ পর্যন্ত করা সম্ভব।

কৃষকদের মসলা চাষের কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করলে তাদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার, মসলা জাতীয় ফসলে রোগ বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান ও সম্প্রসারনের সুযোগ রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে উৎপাদনের পরিমান এবং একর প্রতি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। উচ্চ ফলনশীল জাতের মসলা চাষের মাধ্যমে ফলন কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ পর্যন্ত করা সম্ভব।

উন্নত জাতের ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষকদের উৎপাদিত ফসল সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করা হলে বাজারে ন্যায্য দাম প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের দরকষাকষির সুযোগ বাড়বে ফলে বাজারের চাহিদা বিবেচনা করে ভাল দামে তারা ফসল বিক্রি করতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে কৃষক সমিতি গঠন করে এ সমিতির মাধ্যমে একটি সংরক্ষনাগার বা সংগ্রহ কেন্দ্র পরিচালনা করা যায়।

স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের দ্বারা মসলা প্রক্রিয়াজাত করণ করা হলে উৎপাদিত মসলার বাজার সম্প্রসারিত হবে। মসলা প্রক্রিয়াকরণে উদ্যোক্তা ও শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

উপরোক্ত সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগিয়ে বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মসলা চাষে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করে বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে মসলা আবদের এ সেক্টরকে আরো বিকশিত করতে এ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন এ সেক্টর হতে দেশজ চাহিদা মিটবে অন্যদিকে চাষীদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ উচ্চ ফলনশীল জাতের মসলা চাষের প্রচলন এবং আধুনিক পদ্ধতিতে মসলা চাষের মাধ্যমে পাহাড়ী আদিবাসী কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, আয় বৃদ্ধি করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মসলা আবাদকে টেকসই আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা, ছোট ও মাঝারী আয়ের উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি করা। পাহাড়ি অঞ্চলের চাষীদের মধ্যে উচ্চ ফলনশীল জাতের মসলা জাতীয় ফসল চাষের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা। কৃষকদেরকে মান সম্পন্নভাবে মসলা জাতীয় ফসল সংরক্ষন প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা

উক্ত প্রকল্পের কর্ম এলাকা হিসাবে চট্রগ্রাম জেলার মিরসরাই ও ফটিকছড়ি উপজেলার পাহাড়ী অঞ্চলের করের হাট ও দাঁতমারা ইউনিয়নকে নির্বাচন করা হয়েছে। এসব ইউনিয়নে আনুমানিক ৫০ হাজার মানুষ তাদের জীবিকার জন্য মিরসরাই ও ফটিকছড়ির সংরক্ষিত পাহাড়ী বনাঞ্চলের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নির্ভর করে। তন্মধ্যে ১৫ হাজার স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী মসলা চাষ ও বাজারজাতকরনের সাথে সংযুক্ত। ফটিকছড়ি এলাকাতে মসলার তুলনামুলক বেশি হওয়ায় এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী মসলা চাষ বিপনন ও বাজারজাতকরণের সাথে নিয়োজিত। যদিও মসলা চাষ একটি লাভজনক ব্যবসা তথাপি ভূমিহীন দরিদ্র এসব জনগোষ্ঠীর পক্ষে মসলা চাষ বা অন্যান্য কৃষিজফসল চাষ করা সম্ভব নয়। যেহেতু মসলা চাষে সফলতা ও ব্যর্থতা দুটোই আছে এবং এসব এলাকার কৃষকেরা সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে তাই প্রকল্পের পক্ষ হতে অপকা ২৫০ জন চাষী নির্বাচন করে তাদেরকে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে যাতে করে তারা মসলা চাষ করে তাদের টেকসই জীবিকা তৈরি করতে সক্ষম হয়। প্রকল্পের প্রভাবে ইতিমধ্যে এ এলাকাগুলোতে মসলা চাষের ব্যপক সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং নতুন করে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আশা করা হচ্ছে প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসাবে ধীরে ধীরে এ সাব সেক্টর আরো অনেক বেশি বিকশিত হবে এবং আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে আরো বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রকল্প এলাকায় ২৫০ জন চাষীকে প্রাথমিক জরিপের ভিত্তিতে যাচাই বাছাই করে মসলা চাষ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।এই ২৫০ জন চাষীকে ১০ টি গ্রুপ বা দলে ভাগ করে বিশেষজ্ঞ দ্বারা মসলা চাষের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষনে মসলা চাষ,মসলার পুষ্টিমান, মসলার পরিচিতি, জাত, মাটি এবং জলবায়ু, জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, বীজ পরিচিতি, বীজতলা তৈরি, মসলার সময়কাল, বীজ লাগানো, মালচিং, অন্তবর্তী পরিচর্যা, পোকা ও রোগ দমন ব্যবস্থা, শস্য পর্যায়, ফসল তোলা, ফলন, ফসল সংরক্ষণ, বীজ সংরক্ষণ, মসলা চাষের সমস্যা ও সমাধান, মসলার অন্তবর্তী ফসল, মাটি শুদ্ধকরন, মসলা পরিবহন ও বাজারজাতকরন, মসলার ভেষজ ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।

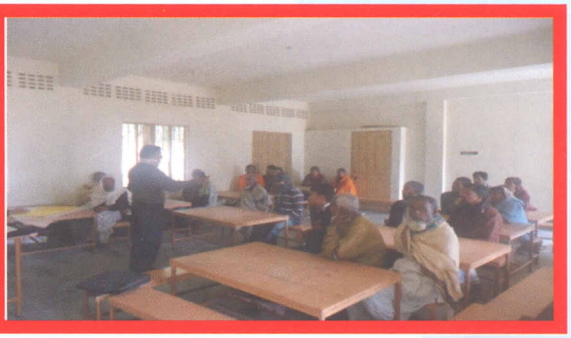

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রকল্প এলাকায় ২৫০ জন চাষীকে প্রাথমিক জরিপের ভিত্তিতে যাচাই বাছাই করে মসলা চাষ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।এই ২৫০ জন চাষীকে ১০ টি গ্রুপ বা দলে ভাগ করে বিশেষজ্ঞ দ্বারা মসলা চাষের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষনে মসলা চাষ,মসলার পুষ্টিমান, মসলার পরিচিতি, জাত, মাটি এবং জলবায়ু, জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, বীজ পরিচিতি, বীজতলা তৈরি, মসলার সময়কাল, বীজ লাগানো, মালচিং, অন্তবর্তী পরিচর্যা, পোকা ও রোগ দমন ব্যবস্থা, শস্য পর্যায়, ফসল তোলা, ফলন, ফসল সংরক্ষণ, বীজ সংরক্ষণ, মসলা চাষের সমস্যা ও সমাধান, মসলার অন্তবর্তী ফসল, মাটি শুদ্ধকরন, মসলা পরিবহন ও বাজারজাতকরন, মসলার ভেষজ ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।

প্রশিক্ষণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে মসলা চাষ শিখানো এবং চাষ সম্প্রসারন করা; নির্বাচিত চাষীদের মাধ্যমে উন্নত জাতের মসলা চাষের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করে উন্নত জাতের মসলা চাষে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা; প্রকল্পভূক্ত কৃষকদের মসলা চাষের খরচ কমানোর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা এবং এ অঞ্চলের মসলা জাতীয় ফসলের বাজার সম্প্রসারিত করা ও মসলা সেক্টরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।

মসলার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন

আধুনিক পদ্ধতিতে মসলা চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে মসলা চাষের ৪৫টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছিল। প্রদর্শনী প্লট/ডেমো প্লট করার জন্য এর মধ্যে থেকে ২২ জন চাষীকে আদার বীজ দেওয়া হয়েছে ৩৫ কেজি করে, ১৮ জন চাষীকে হলুদের বীজ দেওয়া হয়েছে ৩৫ কেজি করে, বাকী ০৫ জন চাষীকে ৬০০টি করে হাইব্রিড মরিচের চারা (মেটালের পিকনিক, হাইব্রিড বর্ষা, ধানিয়া) দেওয়া হয়েছে। গত মৌসুমে নির্বাচিত চাষীদের ফসলের ফলন ভালো হওয়ার কারণে কৃষকেরা উচ্চ ফলনশীল জাত চাষে আগ্রহী হয়েছে এবং তারা তাদের ফসল গুলোর বেশি অংশ বিক্রি না করে বীজ হিসেবে রেখে দিয়েছে।

হাইব্রিড মসলার চাষে বিজ বিতরণ কর্মসূচি

প্রকৃতপক্ষে এখানকার কৃষকেরা জুম পদ্ধতিতে বা সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে। এতে করে তারা ফলন কম পাচ্ছে এবং আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫০ জন চাষী নির্বাচন করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে আমরা ২৫০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৪৫টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করে তাদের ফসল ফলনের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। প্রশিক্ষণের ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এর ফলে তারা উচ্চ ফলনশীল জাতের মসলা চাষ করছে এবং পোকা ও রোগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে । আধুনিক প্রশিক্ষণের ফলে তাদের ব্যয় কমে গিয়ে আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । আগের তুলনায় তাদের ফলন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, আগে তারা একমন আদা বীজ থেকে ৪-৫ মণ ফলন পেত কিন্তু বর্তমানে তারা একমণ আদা বীজ থেকে ১০-১২ মণ ফলন পাচ্ছে।

মসলার তথ্য ব্যবস্থাপনা

আধুনিক পদ্ধতিতে মসলা চাষ ব্যবস্থাকে কৃষকের গ্রহণযোগ্য করতে মসলা চাষের বিভিন্ন কারিগরী দিক এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয় তুলে ধরে প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার বিভিন্ন ছবি সম্বলিত লিপলেট ও বুকলেট সরবাহ করা হয়েছে। মসলা চাষের উপর সম্পাদিত বুকলেট ও লিফ্লেট হতে চাষীরা তাদের মসলা চাষের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে জানতে পারছে।

বাজার সংযোগ কর্মশালার আয়োজন

আমাদের দেশে মসলা একটি সম্ভবনাময় শিল্প। আমাদের দেশে খাদ্য তালিকায় ক্রমান্বয়ে এটি স্থান করে নিলেও বহিঃবিশ্বে মসলা সম্পদটির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। যথাযথ মার্কেটিং লিংকেজ স্থাপন করা গেলে মসলা চাষ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। মসলা মূলত রপ্তানী নির্ভর হওয়ার মসলার মার্কেট চেইনে রপ্তানিকারদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। এ কারণেই মার্কেট লিংকেজের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মসলা বাজারজাত করণ পদ্ধতি বেশ জটিল ও বহুমুখী। বেশিরভাগ চাষী স্থানীয় বাজারে ব্যাপারী ও ফরিয়ার কাছে কম দামে তাদের ফসল বিক্রি করে থাকে। স্থানীয় বাজারে রপ্তানিকারীদের সাথে চাষীদের কোন যোগাযোগ নেই। তারা কিছু এজেন্ট এর উপর নির্ভর করে রপ্তানির জন্য মসলা সংগ্রহ করে। চাষীদের সাথে বড় মালিক বা রপ্তানিকারকদের সরাসরি সংযোগের অভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চাষীরা ন্যায্যমূল্য পেত না।

প্রকল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও ছিল চাষীরা যাতে তাদের মসলা চাষ হতে অধিক লাভবান হতে পারে এজন্য বাজার সংযোগ স্থাপন করা। বাজার সংযোগ কর্মশালার মাধ্যমে চাষীদের মসলা শিল্পে বিদ্যমান মসলার বিভিন্ন বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণ করার জন্য উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে শহর কেন্দ্রিক বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে চাষী ও উদ্যোক্তার যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ ফলে মসলা চাষীরা পূর্বের তুলনায় বেশি দামে তাদের উৎপাদিত মসলা বিক্রি করতে সক্ষম হচ্ছেন।

রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান

আধুনিক পদ্ধতিতে মসলা চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে মসলা চাষের ৪৫ টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছিল। প্রদর্শনী প্লট/ডেমো প্লট করার জন্য এর মধ্যে থেকে ২২ জন চাষীকে আদার বীজ দেওয়া হয়েছে ৩৫ কেজি করে, ১৮ জন চাষীকে হলুদের বীজ দেওয়া হয়েছে ৩৫ কেজি করে, বাকি ৫ জন চাষীকে ৬০০টি করে হাইব্রিড মরিচের চারা (মেটালের পিকনিক, হাইব্রিড বর্ষা, ধানিয়া) দেওয়া হয়েছে। গত মৌসুমে নির্বাচিত চাষীদের ফসলের ফলন ভালো হওয়ার কারণে কৃষকেরা উচ্চ ফলনশীল জাত চাষে আগ্রহী হয়েছে এবং তারা তাদের ফসল গুলোর বেশী অংশ বিক্রি না করে বীজ হিসেবে রেখে দিয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথমদিকে মসলা চাষীদেরকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের শিক্ষণসমূহ যাতে মাঠ পর্যায়ে হুবহু প্রয়োগ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে প্রকল্পের শেষ দিকে একটি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষনের সময় প্রদত্ত বিভিন্ন কারিগরি বিষয় এবং তথ্য পুনঃউপস্থাপন করা হয়। এতে করে প্রশিক্ষণের শিক্ষণসমূহ দীর্ঘমেয়াদী করা হয়। রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণটি জন্য ১৫০ জন চাষীকে নির্বাচন করা হয়। ১৫০ জন চাষীকে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

কৃষক সমিতির চাষীদের মাসিক সভা আয়োজন

যে কোন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে একেক জন চাষী একেক রকমের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। মসলা চাষ বা চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুফল ও বাধাসমূহ এবং এ সকল সমস্যা মোকাবেলার অভিজ্ঞতা পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত ব্যক্তিরা অনেক বেশি লাভবান হতে পারে। তাই প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতিতে মসলা চাষ বা চাষীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য কৃষক সমিতিতে প্রতি মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উক্ত সভায় আধুনিক পদ্ধতিতে মসলার চাষ, পোকা-মাকড়, রোগ সম্পর্কে আলোচনা ও সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ইস্যু ভিত্তিক সভা আয়োজন

মসলা চাষের ক্ষেত্রে মসলা চাষীরা প্রশিক্ষনলব্ধ প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান যাতে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে মসলার চাষ বা চাষের ক্ষেত্রে নানান বিষয়ে নিয়মিতভাবে তাদেরকে হালনাগাদ তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ১০টি ইসুভিত্তিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সার্বক্ষণিক কারিগরী পরামর্শ সেবা প্রদান

প্রকল্পের আওতায় একজন টেকনিক্যাল এবং একজন সহকারি টেকনিক্যাল অফিসার নিয়মিত চাষীদের ক্ষেত এবং প্রদর্শনী প্লটগুলো পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ সেবা প্রদান করেন। প্রকল্প কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকির ফলে চাষীরা মসলা চাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা হতে রক্ষা পেয়ে লাভজনকভাবে মসলা চাষে সমর্থ হয়েছে।

প্রকল্পের প্রভাব

দুই বছরব্যাপী "আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চফলনশীল জাতের মসলা উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের আয়বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব হিসাবে মসলা চাষে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মসলার পরিচিতি, জাত, মাটি এবং জলবায়ু, জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, বীজ পরিচিতি, বীজতলা তৈরি, মসলার সময়কাল, বীজ লাগানো, মালচিং, অন্তবর্তী পরিচর্যা, পোকা ও রোগ দমন ব্যবস্থা, শস্য পর্যায়, ফসল তোলা, ফলন, ফসল সংরক্ষণ, বীজ সংরক্ষণ, মসলা চাষের সমস্যা ও সমাধান সকল কর্মকান্ডে ধনাত্মক পরিবর্তন হয়েছে।

জাত উন্নয়ন

ভাল ফলন পাওয়ার জন্য জাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ভালো জাতের উপর নির্ভর করে কৃষকের ক্ষেতের ফলন বেশি পাওয়া। প্রকল্পের শুরুতে আমরা যখন জরিপ তৈরি করি তখন চাষীরা জাত না দেখে স্থানীয় জাত রোপণ করত, ফলে নিদিষ্ট পরিমান ফলন পেত না। কাঙ্খিত পরিমান ফলন প্রাপ্তির জন্য চাষের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভালো জাতের উপর নজর দিতে হবে। কারণ ভাল জাতের উপর নির্ভর করে ফসলের ফলন অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপ হতে দেখা যায় বর্তমানে ৯০ ভাগ চাষী উন্নত জাতের ফসল চাষ করেন।

বিবরণ	স্থানীয় জাত (%)	উন্নত জাত (%)	মোট (%)
প্রাক মূল্যায়ন	১০০	০	১০০
চুড়ান্ত মূল্যায়ন	১০	৯০	৯০

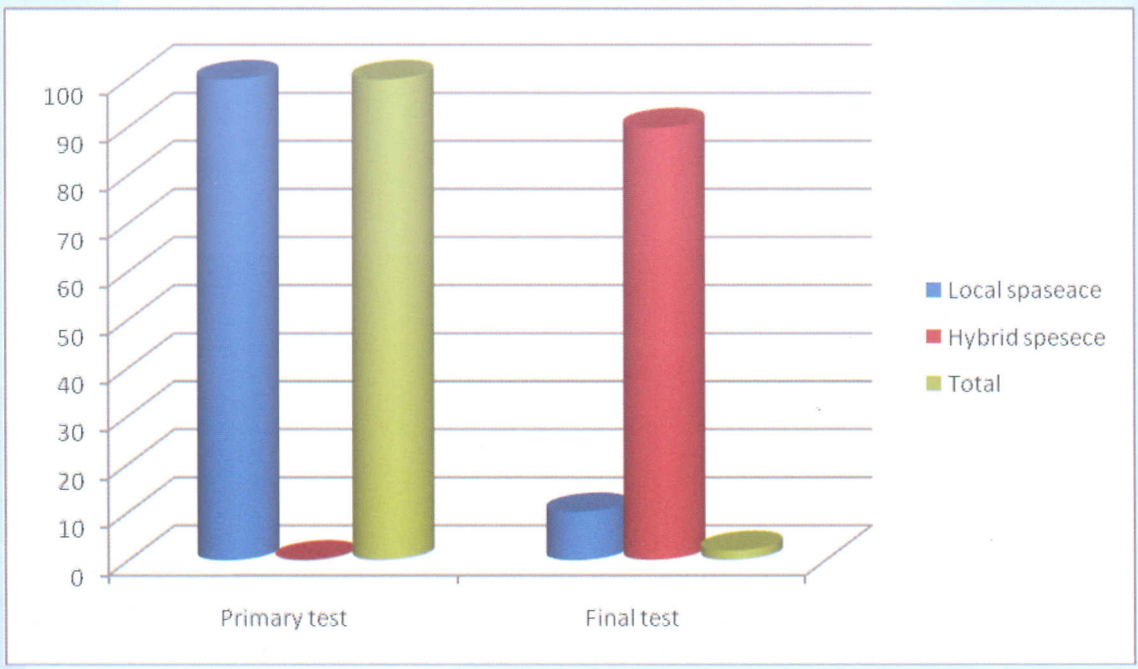

জমি তৈরি ও ব্যবস্থাপনা

প্রাক-মূল্যায়ন হতে দেখা যায় বেশির ভাগ চাষী ভালো করে জমি পরিষ্কার না করেই জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে। কিন্তু চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপে দেখা যায় তারা জমি হতে সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে ৪/৫ বার চাষ মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে জমি তৈরি করে।

বিবরণ	জমি তৈরি করেনা (%)	জমি তৈরি করে(%)	মোট (%)
প্রাক মূল্যায়ন	৯০	১০	১০
চুড়ান্ত মূল্যায়ন	০	১০০	১০০

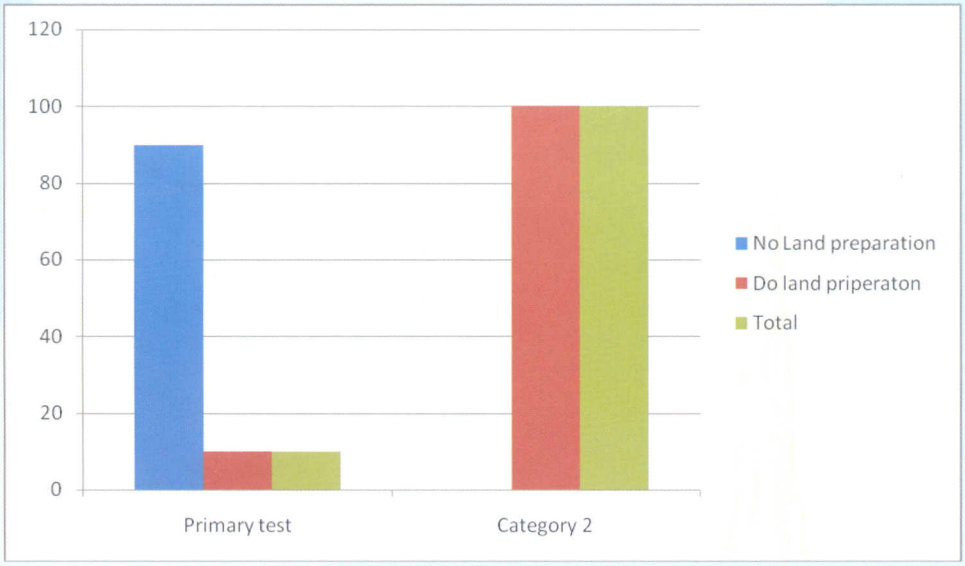

মসলার ভালো ফলন পেতে হলে সুষমভাবে সারের ব্যবহার প্রয়োজন। প্রাক মূল্যায়ন জরিপে দেখা যায় তারা সুষমভাবে সারের ব্যবহার না করে গতানুগতিক কিছু সার প্রয়োগ করে ফসল উৎপাদন করে। ফলে তারা আশানুরুপ ফলন পায় না। কিন্তু চুড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপে দেখা যায় শতকরা ৮০ ভাগ চাষী সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করে ফষল উৎপাদন করে।

বিবরণ	সার প্রয়োগ করে না(%)	সার প্রয়োগ করে (%)	মোট (%)
প্রাক মূল্যায়ন	৬০	৪০	৪০
চুড়ান্ত মূল্যায়ন	০	১০০	১০০

বীজতলা তৈরি ও ব্যবস্থাপনা

জমিতে বীজ লাগাতে গেলে প্রথমে ৫০-৬০ সে. মি. প্রস্থের বীজতলা তৈরি করতে হবে।এতে দুই বীজতলার মাঝে ২০ সে.মি. গভীর নালা করতে হবে ।নালার মাটি ভেলীতে তুলে সমান করে দিতে হবে। এরপর ৩০-৪০ সে.মি. দূরে সারি রেখে বীজ লাগাতে হবে। বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ২০ সে.মি. হতে হবে। কিন্তু প্রাক মূল্যায়নে দেখা যায় যে বেশির ভাগ চাষী বীজতলা তৈরি না করে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে বীজ রোপণ করে থাকে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপে দেখা যায় যে, শতভাগ চাষী বীজতলা তৈরি করে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বীজ বপন করে।

বিবরণ	বীজতলা তৈরি করে না (%)	বীজতলা তৈরি করে (%)	মোট (%)
প্রাক মূল্যায়ন	৯০	১০	১০
চুড়ান্ত মূল্যায়ন	০	১০০	১০০

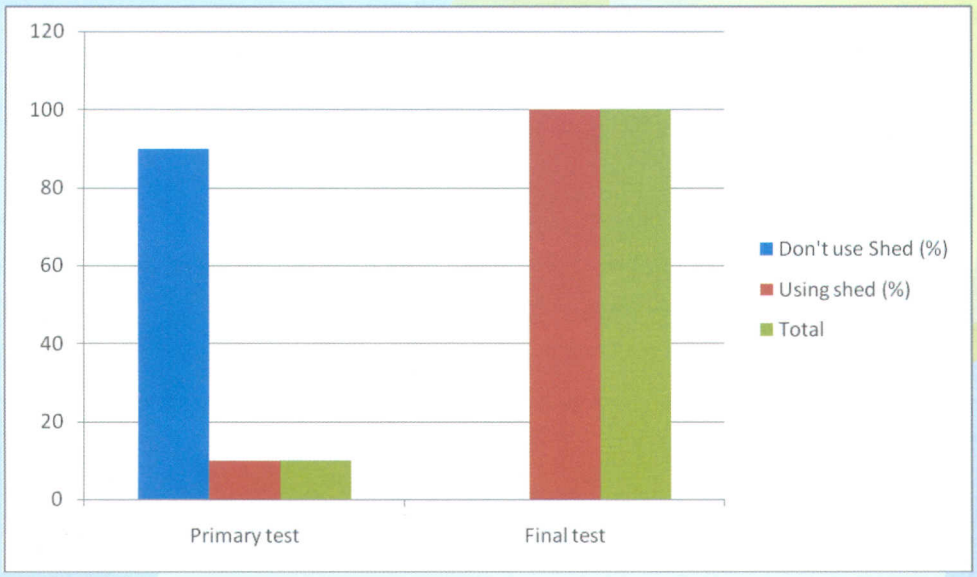

মসলার চাষে পোকা ও রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

ভাল ফলন পেতে হলে মসলার পোকা ও রোগ দমনে সচেতন হতে হবে। কারন রোগ ও পোকার আক্রমণে আমাদের দেশে এক-তৃতীয়াংশ ফসল নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু দেখা যায় এখানকার চাষীরা অজ্ঞতার কারণে তারা রোগ ও পোকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রকল্পের প্রাক-মূল্যায়ন জরিপ করার সময় দেখা যায় যে বেশিরভাগ চাষী পোকা ও রোগ দমনে সচেতন নয়। কিন্তু চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপে দেখা যায় যে, শতভাগ চাষী পোকা ও রোগ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন।

বিবরণ	পোকা ও রোগ দমনে সচেতন নয় (%)	পাকা ও রোগ দমনে সচেতন (%)	মোট (%)
প্রাক মূল্যায়ন	৮০	২০	২০
চুড়ান্ত মূল্যায়ন	০	১০০	১০০

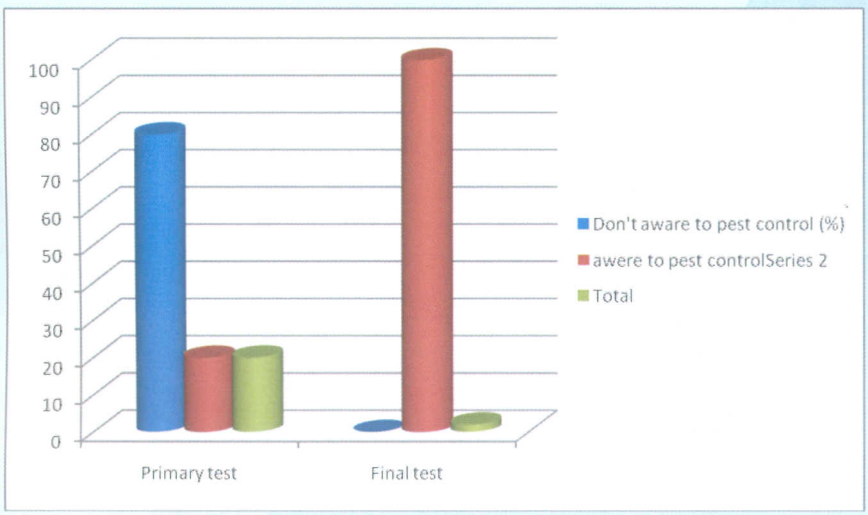

ফসল পরিচর্যা

একই জমিতে বার বার মসলা চাষ করা উচিত নয় । তাতে পোকা ও রোগের আক্রমণ বেড়ে যায়। তাই শস্য পর্যায় অবলম্বন করা উচিত। প্রাক মূল্যায়ন জরিপ কালে দেখা যায় যে কোন চাষী শস্য পর্যায় অবলম্বন না করে প্রতি বছর একই জমিতে একই মসলা চাষ করে থাকে। কিন্তু চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপে দেখা যায় যে শতভাগ চাষী তাদের জমিতে শস্য পর্যায় অবলম্বন করছে।

বিবরণ	শস্য পর্যায় অবলম্বন করেনা (%)	শস্য পর্যায় অবলম্বন করে(%)	মোট (%)
প্রাক মূল্যায়ন	১০০	০	১০০
চুড়ান্ত মূল্যায়ন	০	১০০	১০০

মসলা বীজ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

মসলা জাতীয় ফসল বীজ হিসেবে সংরক্ষন করলে অনেক বেশি দামে বিক্রি করা যায় এবং আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।আমাদের দেশের বেশির ভাগ কৃষক তাদের মসলা জাতীয় ফসল বীজ হিসেবে সংরক্ষণ না করে বাজারে বিক্রি করে দেয়। প্রাক মূল্যায়ন জরিপে দেখা যায় যে শতকরা ১০ ভাগ চাষী তাদের উৎপাদিত ফসল বীজ হিসেবে সংগ্রহ করে এবং বাকিগুলো বিক্রি করে দেয়। কিন্তু চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপে দেখা যায় যে শতকরা ১০০ ভাগ চাষী তাদের উৎপাদিত ফসল বীজ হিসেবে সংগ্রহ করে ।

বিবরণ	বীজ সংরক্ষন করে না (%)	বীজ সংরক্ষন করে (%)	মোট (%)
প্রাক মূল্যায়ন	৯০	১০	১০
চুড়ান্ত মূল্যায়ন	০	১০০	১০০

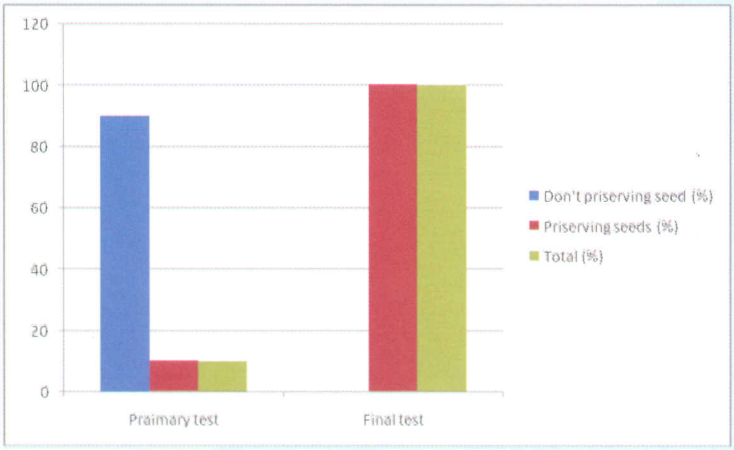

ফসল পরিচর্যা

একই জমিতে বার বার মসলা চাষ করা উচিত নয় । তাতে পোকা ও রোগের আক্রমণ বেড়ে যায়। তাই শস্য পর্যায় অবলম্বন করা উচিত। প্রাক মূল্যায়ন জরিপ কালে দেখা যায় যে কোন চাষী শস্য পর্যায় অবলম্বন না করে প্রতি বছর একই জমিতে একই মসলা চাষ করে থাকে। কিন্তু চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপে দেখা যায় যে শতভাগ চাষী তাদের জমিতে শস্য পর্যায় অবলম্বন করছে।

চাষকৃত জমি সংক্রান্ত তথ্য

ফসলের নাম	কৃষকের সংখ্যা (জন)	প্রাক্-মূল্যায়নে চাষকৃত জমি (শতাংশে)	চুড়ান্ত মূল্যায়নে চাষকৃত জমি (শতাংশে)	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)
আদা	১১২	৩৯৮৬	৪৯৮৪	গড়ে ২২% চাষযোগ্য জমির পরিমান বেড়েছে
হলুদ	৯৮	৩৭৫২	৪৭৪২	
মরিচ	৪০	১৮০৮	২০০৬	
মোট	২৫০	৯৫৪৬	১১৭৩২	

প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন জরিপ অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত ২৫০ জন চাষীর মসলা চাষের আওয়তায় মোট জমির পরিমান ছিল ৯৫৪৬ শতাংশ। অথ্যাৎ চাষী প্রতি গড় জমির পরিমান ছিল ৩৮.১৮ শতাংশ। প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরনের কারিগরী সহায়তার প্রদানের ফলে বর্তমানে চুড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপ অনুযায়ী ২৫০ জন চাষীর মসলা চাষের আওয়তায় মোট জমির পরিমান দাড়িয়েছে ১১,৭৩২ শতাংশে। অর্থাৎ চূড়ান্ত জরিপ অনুযায়ী গড় জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৬.৯২ শতাংশ অর্থাৎ মশলা চাষের জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২২%।

পাহাড়ি এলাকার জনগণ জুম চাষের মাধ্যমে আদা, হলুদ ও মরিচ উৎপাদন করছে। পূর্বে উন্নত বীজ প্রাপ্তি, বীজ সংরক্ষণ ও শোধন সম্পর্কে তাদের ধারণা না থাকায় প্রতি বছর আদা হলুদের ক্ষেত পচনরোগে আক্রান্ত হয়ে ব্যাপক পরিমাণ জমির ফসল নষ্ট হয়ে যেত। বর্তমানে ভাল বীজ প্রাপ্তি, প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের ফলে ফসলের উৎপাদন খরচ হ্রাস পেয়েছে এতে করে কৃষকরা আগের তুলনায় আগ্রহী হয়েছে। এতে পূর্বের তুলনায় এ জাতীয় ফসলের চাষে চাষীর সংখ্যা ও জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য

ফসলের নাম	কৃষকের সংখ্যা (জন)	প্রাক্-মূল্যায়নে গড়ে প্রতি শতাংশে উৎপাদন (কেজি)	চুড়ান্ত-মূল্যায়নে গড়ে প্রতি শতাংশে উৎপাদন (কেজি)	মন্তব্য
আদা	১১২	২৫	৩৫	
হলুদ	৯৮	২০	২৪	
মরিচ	৪০	৬	৮	
মোট	২৫০	-	-	

'মসলা চাষ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের প্রধান অর্জন হল মসলা চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি। প্রাক্- মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপ-এর ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় প্রাক মূল্যায়ন অনুযায়ী প্রতি শতাংশে আদা, হলুদ ও মরিচ জাতীয় মসলার উৎপাদন ছিলো যথাক্রমে ২৫ কেজি, ২০ কেজি ও ৬ কেজি কিন্তু বর্তমানে প্রতি শতাংশে ৩৫ কেজি, ২৪ কেজি ও ৮ কেজি । অর্থাৎ শতাংশ প্রতি আদা ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে, হলুদ ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মরিচ ৩৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।

মসলা পচন সংক্রান্ত তথ্য

মসলা চাষের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরী সহায়তা প্রদান, মসলার পচনের হার নিয়ন্ত্রণ, মাটি পরীক্ষার সহায়তা প্রদান, অব্যাহত পরামর্শ সেবা প্রদানের ফলে মসলার পচন রোধ অনেক বেশি হ্রাস পেয়েছে। এ তিন ধরনের মসলার ক্ষেত্রে গড়ে পচনের হার প্রাক্-মূল্যায়ণ জরিপে ছিলো প্রায় ৪০%। প্রকল্পের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মসলার পচন ১০-১৫% এর নিচে নামিয়ে আনা কিন্তু চূড়ান্ত মূল্যায়নে এসে পচনের হার গড়ে দাঁড়িয়েছে ৮-১০% অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় পচনের হার প্রায় ৩০% হ্রাস পেয়েছে। মসলা চাষের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা এবং মসলার পচনের প্রাথমিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাসহ অব্যাহত পরামর্শ প্রদানের ফলে মসলা পচনের হার হ্রাসকরণ সম্ভব হয়েছে।

উৎপাদন খরচ সংক্রান্ত তথ্য

মোট চাষী	প্রক-মূল্যায়ন জরিপে মোট গড় উৎপাদন (কেজি)	মোট খরচ (টাকায়)	চুড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপে মোট গড় উৎপাদন (কেজি)	মোট খরচ (টাকায়)	প্রতি কেজিতে খরচ হ্রাস/বৃদ্ধি
২৫০ জন	১৮৫৫২০	২৭৮২৮০০	২৪৪০০০	৩২৯৪০০০	১০% হ্রাস

প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব সরূপ ২৫০ জন চাষীর চুড়ান্ত মূল্যায়নে দেখা যায় মোট চাষকৃত জমিতে উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ছিল প্রায় ১৫ টাকা যা কমে এসে দাড়িয়েছে ১৩.৫ টাকা অর্থাৎ উৎপাদন খরচ প্রায় ১০% কমেছে।

আয় সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	চাষকৃত জমির পরিমান (শতাংশ)	মোট খরচ (টাকা)	কেজি প্রতি গড় উপাদন খরচ	মোট বিক্রয় (টাকা)	গড় বিক্রি প্রতি কেজি (টাকা)	প্রতি কেজিতে লাভ (%)	মন্তব্য
প্রাক-মূল্যায়ন	৯৫৪৬	২৭৮২৮০০	১৫.০	৩২৪৬৬০০	১৭.৫	১৭% (প্রায়)	
চুড়ান্ত মূল্যায়ন	১১৭৩২	২৪৪০০০	১৩.৫	৪৬৩৬০০০	১৯.০	৪০%(প্রায়)	

প্রশিক্ষণের শিখনসমূহ কাজে লাগানোর ফলে মসলা উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে মসলার চাহিদা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাওয়ার ফলে চাষীদের আয়বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। উন্নত ও উচ্চফলন শীল জাতের মসলা উৎপাদন, উৎপাদন খরচ কম হওয়া প্রকল্পে শুরুর সময়ের তুলনায় বর্তমানে মসলা চাষে প্রতি কেজিতে লাভ ২০-২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য

কৃষকের সংখ্যা	প্রাক-মূল্যায়ন জরীপে মসলা উৎপাদনে জড়িত ছিল	চুড়ান্ত -মূল্যায়ন জরীপে মসলা উৎপাদনে জড়িত রয়েছে	বর্তমান অবস্থায় হ্রাস/বৃদ্ধি
২৫০ জন	৬০০ জন	৭৫০ জন	২৫% (বৃদ্ধি)

নতুন কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ন উদ্দেশ্য ছিল। প্রকল্পের শুরুতে প্রাক- মূল্যায়ন অনুযায়ী ২৫০ জন চাষীর মসলা ক্ষেতে ৬০০ জন লোক মসলা চাষের সাথে নিয়োজিত ছিল। চুড়ান্ত মূল্যায়ন জরীপ অনুযায়ী ২৫০ জন চাষীর ক্ষেতে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ৭৫০ জন। অর্থাৎ প্রকল্পের ইন্টারভেনশনের ফলে প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্প এলাকায় ২৫০ জন চাষীর খামারে ২৫% অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

পাহাড়ি এলাকায় বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হওয়ায় বিভিন্ন রোগ-বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হয় ফলে চাষীরা যে অনুপাতে চাষ করে সে অনুপাতে ফসল পায় না। মশলা জাতীয় ফসলের রোগ ও পোকামাকড় সম্পর্কে আদিবাসী পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অজ্ঞতা ও উন্নত জাতের মশলা চাষ সম্পর্কে দক্ষতা না থাকায় তারা চাষ করতে কম আগ্রহী। তা ছাড়া পাহাড়ি জনপদে নতুন নতুন রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে যার বেশিরভাগ রোগের প্রতিরোধ-প্রতিকার ব্যবস্থার তেমন উন্নয়ন ঘটেনি।

প্রকল্প এলাকায় চাষীরা আদা, হলুদ, মরিচের পাশাপাশি বিভিন্ন সবজির চাষ করতে তারা স্থানীয় মহাজনদের নিকট হতে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে ফসল ফলায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টাকার অভাবে অগ্রিম ফসল বিক্রি করে দেয় ফলে চাষীরা মশলা চাষে ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির সন্মুখীন হচ্ছে।

উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণ অত্র এলাকায় একটি বড় ধরনের সমস্যা। পাহাড়ি জনপদে বাজার ব্যবস্থা গড়ে না উঠায় চাষীদের উৎপাদিত ফসল বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি করতে হয়।

সুপারিশ

কৃষকেরা যাতে মানসম্মত ও রোগমুক্তভাবে মশলা চাষ করতে পারে সে জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা। প্রকল্প এলাকায় মশলা সাথে জড়িত সকল স্টেকহোল্ডারদের গতিশীল আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন করার জন্য কর্মশালার আয়োজন করা এবং বাজার সংযোগ কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন করা।

প্রকল্প এলাকার পাশাপাশি পার্বত্য এলাকার সব জেলা এবং বগুড়া, রাজশাহী, নাটোর, রাজশাহী জেলায় মশলা চাষের ব্যবসাগুচ্ছ গড়ে উঠেছে। এসব এলাকার মশলা চাষীদেরকে অনুরূপ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক পদ্ধতিতে মশলা ফসল অভ্যস্ত করানো সম্ভব হলে দেশে মশলা জাতীয় চাষের উপখাত দ্রুত বিকশিত হতে পারে। এর ফলে মশলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বহুগুন বৃদ্ধি পাবে এবং মশলার আমদানি-নির্ভরতা কমবে।

উপসংহার

এটি একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এ প্রকল্পের কারিগরি জ্ঞান মসলা চাষের সাথে জড়িত উদ্যোক্তা পর্যায়ে যথাযথভাবে প্রয়োগে সহায়ক হিসেবে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়ন প্রকল্পটির লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ অবদান রেখেছে । মসলা চাষের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাগণ এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে প্রযুক্তি জ্ঞান লাভ করেছে তার প্রয়োগ করে লাভবান হতে পারছে বিধায় তা ভবিষ্যতে ও অব্যহত থাকবে। এছাড়া প্রকল্পভুক্ত মসলা চাষের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের সফলতা দেখে এবং প্রকল্পভূক্ত চাষীদের সহায়তা প্রকল্প বহির্ভূত জনগোষ্ঠী ও প্রকল্প চলাকালীন সময়ের মত ভবিষ্যতেও উপকৃত হতে থাকবে।

সাফল্যগাথা : এক

মহন ত্রিপুরা এখন মস্তবড় আদার ব্যবসায়ী

মোহন ত্রিপুরা, পিতা-লক্ষ্মী কুমার ত্রিপুরা, মাতা-রথলক্ষ্মী ত্রিপুরা। গ্রাম-কয়লা, বড়পাড়া, মিরসরাই, চট্টগ্রাম। ২ মেয়ে বাবা-মা, স্ত্রী ও বোনসহ সাতজনের পরিবার। আর্থিক অসংগতি থাকার কারণে খুব বেশি লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। এসএসসি পাস করেই জীবনযুদ্ধে জীবিকার তাগিদে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ানোর পর অসহায় হয়ে পড়েছিল, ঠিক তখনই "অপকা-ভ্যালু চেইন প্রকল্প"-এর সহকারি টেকনিক্যাল অফিসারের মাধ্যমে আদা চাষের প্রকল্পের কথা জানতে পারে। প্রকল্পে মাধ্যমে অপকা থেকে প্রদানকৃত উন্নত আদা বীজ এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর নিজবাড়ির অদূরে টিলার উপর পরিত্যক্ত নিজের দখলকৃত ৫ শতক জমিতে আদা চাষ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চাষ পরবর্তী "অপকা-ভ্যালু চেইন প্রকল্প"-এর টেকনিক্যাল অফিসার সহ-উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তার দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী ৫ শতক জমিতে ৩৫ কেজি বীজ রোপণ করে। সে নিজে এবং তার কৃষক বাবার অক্লান্ত পরিশ্রমে সঠিক রক্ষণা-বেক্ষণের মাধ্যমে অন্যান্য কাজের ভেতরে আদা চাষে সময় ব্যয় করেন। মাঝে মধ্যে পোকার আক্রমণ বা গাছ হলদে হয়ে যাওয়া বা সামান্য পচার আক্রমণ দেখলেই সাথে সাথেই টেকনিক্যাল অফিসার এবং সহ-উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাহায্য নিয়ে সে সমস্যার সমাধান করতো। প্রশিক্ষণ, উন্নত বীজ সরবরাহ, সময়মতো সার-কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে সে আদা চাষ করে সফল হয়। মাত্র ৫ শতক জমিতে প্রায় ৭ মণ আদার ফলন ঘটায়। আগে যেখানে আড়াই মণ থেকে তিন মণ পর্যন্ত পেত। সে এতে করে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতে এই ৭ মণ আদাই বীজ হিসাবে রেখে দেয় এবং পাহাড়ি টিলার ৪০ শতক জমিতে এই আদা চাষ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে সে ৪০ শতক জমি আদা চাষের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে। আশা করা যায়, এই ৪০ শতকে চাষকৃত আদার ফলনের মাধ্যমে তার বিশাল আর্থিক লাভ হবে এবং ভবিষ্যতে নিজে আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে।

অন্যান্য আদা চাষীদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে আদা সংগ্রহ করে। বাজারে বিভিন্ন আড়ৎদারের কাছে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। মোহন ত্রিপুরা এই পর্যন্ত দুই মৌসুমে প্রায় ৫০-৫৫ মণ আদা বিক্রি করেছে, যা থেকে লাভ হয়েছে ২৫-৩০ হাজার টাকা। আদা চাষে ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাওয়ায় সে সফল হয়েছে, পাশাপাশি অন্তত ৭/৮ জন লোকের কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সাফল্যগাথা : দুই

মুজিবুল হক-এর সফলতার কল্পকথা

মোঃ মুজিবুল হক, পিতা-মৃত-দুধ মিয়া, মাতা-হাজেরা বেগম। সোনারখিল, দাঁতমারা, ফটিকছড়ি, চট্রগ্রাম। বারইয়ারহাট রামগড় রোডের হেয়াকো বাজার হয়ে পূর্বদিকে সোনারখিল গ্রাম। ছোট ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে টিলার উপর ছোট্ট একটি মাটির ঘর বানিয়ে কোনরকম বসবাস করছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে (পাহাড়ি এলাকা) তার পারবারটি একাকী জীবনযাপন করার ক্ষেত্রে ব্রতী হিসাবে নিয়েছেন।

স্বামী-স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়েসহ ৬ সদস্যের বড় সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এই মুজিবুল হক। স্ত্রী অশিক্ষিত গৃহিণী। তার কোন পৈত্রিক সম্পত্তি না থাকায় অন্যের জমি বর্গা হিসাবে চাষ করতে হয়। ফলে বর্গাকৃত জমি চাষ করে জমির মালিককে শর্ত অনুযায়ী দেওয়ার পর খুব একটা লাভবান হতে পারতো না। ফলে অভাব-অনটন লেগেই থাকতো। এত অভাবের মাঝে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করানো তার জন্য ছিল রীতিমত দুঃস্বপ্নের নামান্তর। অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে সমাজে তার অবস্থান ছিল নিচের সারিতে। পরের জমি ও পাহাড়ে বর্গাচাষ করে যে আয় হতো তা দিয়ে সংসার চালানো কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। এভাবে দারিদ্র্যতার সাথে যুদ্ধ করে কাটছিল তার সময়গুলো। একপর্যায়ে তার এতবড় সংসার নিয়ে বেঁচে থাকাই দুষ্কর হয়ে পড়েছিল।

এমতাবস্থায় "অপকা-ভ্যালু চেইন প্রকল্প"-এর টেকনিক্যাল অফিসারের সাথে পরিচয় হয় মুজিবুল হকের এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে আদাচাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়। "অপকা-ভ্যালু চেইন প্রকল্প" কর্তৃক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস পেয়ে সে আদা চাষ করতে আগ্রহী হয়। পরবর্তীতে টেকনিক্যাল অফিসার প্রাথমিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করেন। আদা চাষ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান, প্রশিক্ষণ এবং পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহযোগিতায় ভ্যালু চেইন প্রকল্পের অধীনে আদা চাষের নতুন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীতে আদাচাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হন মুজিবুল হক এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পরবর্তীতে বাড়িতে গিয়ে পাহাড়ি ঢালু জমিতে ৫ শতাংশ জমিতে আদা চাষ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ পর্যায়ে অপকা-ভ্যালু চেইন প্রকল্প থেকে ৩৫ কেজি উচ্চ ফলনশীল আদার বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। টেকনিক্যাল অফিসার ও সহকারি টেকনিক্যাল অফিসার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সার্বিক তত্ত্বধানে থেকে সহযোগিতা করা হয়।

আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত চাষাবাদের মাধ্যমে আদার ফলন পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যায়। পূর্বে যেখানে পাঁচ শতক জমিতে আদা চাষ করে ৪ মণ আদা পেত, সেখানে ভ্যালু চেইন প্রকল্প-এর দেখানো চাষ পদ্ধতি, উন্নত বীজ সরবরাহ এবং সবসময় ফলোআপ ও মনিটরিং-এর কারণে এই আদা প্রতি ৫ শতকে উৎপাদন ১০ মণে দাঁড়িয়েছে । যার বর্তমান মূল্য প্রায় মণপ্রতি ৬০০০ টাকা। তার অপ্রত্যাশিত এই লাভে সে হতবাক এবং আশপাশের কৃষকরাও আশ্চার্যান্বিত হয়ে ছুটে আসেন দেখার জন্য। তারা অনুপ্রাণিত হয়ে তার কাছ থেকে বীজ কেনার জন্য ইতিমধ্যেই অগ্রিম টাকা দিয়ে রেখেছে। মুজিবুল হক খুবই খুশি। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আরো অনেক বড় পরিসরে আদা চাষ সম্প্রসারণ করবে।

সে তার উৎপাদনকৃত ১০ মণ আদা থেকে ৫ মণ আদা বিক্রি করেছে। যার বর্তমান বাজার মূল্য (৬০০০ X ৫) = ৩০,০০০ টাকা। বাকি ৫ মণ আদা থেকে ৩ মণ নিজের জন্য বীজ হিসেবে রেখে বাকি ২ মণ আশ-পাশের কৃষকদের কাছে আদা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিক্রি করবে। ৬,০০০ টাকার মধ্যে উৎপাদন খরচ, ঔষধপত্র, যানবাহন খরচ, সার বাবদ মোট ৫,০০০ টাকা বায় হয়েছে। মুজিবুল হক ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আদা চাষ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাছাড়া প্রতিবেশি কৃষকেরা মুজিবুল হকের কাছ থেকে জানতে চায় তার সফলতার কাহিনী। তার পরিবারে এখন অনাবিল আনন্দ।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কৃষক মুজিবুল হকের ভাগ্য খুব সহজেই পরিবর্তন হয়েছে, মাত্র ৫ শতক জমিতে আদা চাষের মাধ্যমে। সে ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে তার এই আদা চাষের মাধ্যমে সংসারে অভাব-অনটনের অতীতের গ্লানি মুছে ফেলে একটি সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর।

OPCA (অপকা)

Organization for the Poor Community Advancement (OPCA)

Mostannagor, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Mobile: 01819617560, 01818721194

Email:info@opcabd.org

Web: www.opcabd.org